بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সরলতা ও সাদাসিধে জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও ঘটনাবলী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সহজ-সরল ও সাদাসিধে জীবনের বর্ণনা শুরু করেছিলাম। তাঁর সাদামাটা জীবনযাপনের একটি রূপ এমনও ছিল যে, কখনো কখনো তিনি নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেই বাজারে গিয়ে কিনে আনতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে বাজারে যাই। তিনি একজন কাপড় ব্যবসায়ীর কাছে বসেন এবং চার দিরহাম দিয়ে একটি ঢিলেঢালা পায়জামা ক্রয় করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, **একবার হযরত আবু বকর (রা.) আমার ঘরে আসেন। তখন আনসারের দুটি ছোটো মেয়ে আমার কাছে এসে কিছু কাব্যিক গান গাইছিল। তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না, বরং তারা ছিল আমার সহপাঠী বা বান্ধবী। হযরত আবু বকর (রা.) গানের শব্দ শুনে বলেন, মহানবী (সা.)- এর ঘরে তোমরা শয়তানের বাঁশি (অর্থাৎ গান-বাজনা) নিয়ে বসেছ? সেদিন ঈদের দিন ছিল। মহানবী (সা.) একথা শুনে বলেন, হে আবু বকর! প্রতিটি জাতিরই ঈদের আনন্দ থাকে আর আজ আমাদের ঈদ। তাই ওদের গাইতে দাও, বাধা দিয়ো না।** হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পরিবেশটি ছিল একদম সাদামাটা ও অনানুষ্ঠানিক, সেখানে কোনো শির্‌কের কথা হচ্ছিল না; তাই তিনি (সা.) তাদের গাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন শিশুদের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন তাদের সালাম দিতেন, স্নেহের সাথে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। কেউ যদি তাঁর সাথে বসতো বা কোনো প্রয়োজনে কথা বলতো, তাহলে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সেই ব্যক্তির উঠে না যাওয়া পর্যন্ত মন দিয়ে তার কথা শুনতেন এবং বসে থাকতেন। এই সারল্য ও ধৈর্য আগন্তুককে এতটা আত্মবিশ্বাস ও সাহস

যোগাতো যে, সে নিঃসংকোচে তার মনের কথা খুলে বলতে পারতো।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, **আমাদের জামা'তের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদেরও এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা উচিত।**

হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) বলেন, আমি আমার পিতা হযরত আলী (রা.)-র কাছে মহানবী (সা.)-এর মজলিস বা বৈঠকের চিত্র সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেন, **তিনি (সা.) ওঠা-বসা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র স্মরণে মগ্ন থাকতেন। কোনো দলের বৈঠকে গেলে তিনি (সা.) অকৃত্রিমভাবে তাদের মাঝেই বসে যেতেন। তিনি বৈঠকের প্রত্যেক সঙ্গীকে পূর্ণ সম্মান দিতেন। কেউ কখনো একথা মনে করার সুযোগ পেতো না যে, অন্য কেউ তাঁর কাছে বেশি সম্মানিত। তাঁর বদান্যতা ও উত্তম চরিত্র সবার জন্য সমান ছিল এবং তিনি সবার কাছে একজন দয়ালু পিতার মতো ছিলেন।**

হিজরতের সময় মদীনার বাইরে 'কুবা' নামক স্থানে তিনি (সা.) যখন একটি গাছের নিচে বসেছিলেন, মদীনার অধিকাংশ মানুষ যেহেতু তাঁর পবিত্র চেহারা চিনতেন না, তাই লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে মহানবী (সা.) মনে করে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে তাঁর দিকে মুখ করে বসছিল। হযরত আবু বকর (রা.) এটি দেখে সাথে সাথে নিজের চাদর তুলে সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার গায়ে রোদ লাগছে, আমি আপনাকে ছায়া দিচ্ছি। এ কথা শুনে লোকেরা মহানবী (সা.)-কে চিনতে পারেন এবং তাঁকে সালাম প্রদান করেন।

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি একবার মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি; তখন নবী করীম (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) আমার বাড়িতে আসলেন এবং তাঁরা আমাকে অচৈতন্য ও বেহুশ অবস্থায় পেলেন। তখন মহানবী (সা.) ওযূ করলেন এবং সে ওযূর অবশিষ্টাংশ পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দিলেন, ফলে আমার হুশ ফিরে এল।

মহানবী (সা.)-এর জীবনে কোনো কৃত্রিমতা বা ভাবগাম্ভীর্যের আড়ম্বর ছিল না, ছিল অফুরন্ত সরলতা। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকেও এই উপদেশ দিতেন, তারাও যেন সাদাসিধে জীবনযাপন করেন, যাতে তাদের আত্মিক সংশোধন হতে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, **বদরের যুদ্ধের দিন একটি উটে পালাক্রমে তিনজন করে চড়তেন। হযরত আবু লুবাবাহ্ (রা.) এবং হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে একই উটে আরোহণ করতেন। যখন মহানবী (সা.)-এর পায়ে হাঁটার পালা আসে, তখন তাঁরা দুজন নিবেদন করেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনার পরিবর্তে পায়ে হেঁটে যাচ্ছি (আপনি উটেই বসে থাকুন)।" তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমরা দু'জন আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও আর আমিও পুণ্য লাভের ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে উদাসীন নই। তাই যে নিয়ম ঠিক হয়েছে, সে অনুসারেই আমল হবে।**

হযরত আমর বিন হারেস (রা.) বলেন, **মহানবী (সা.) তাঁর মৃত্যুর সময় কোনো দিনার, দিরহাম এবং দাস-দাসী রেখে যাননি- কেবল তাঁর সাদা খচ্চরটি ছাড়া যা তিনি বাহন হিসেবে ব্যবহার করতেন এবং তাঁর ব্যবহারের অস্ত্রশস্ত্র এবং এক খণ্ড জমি রেখে যান, যা তিনি মুসাফিরদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে গিয়েছিলেন।**

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত থেকে এটি যেমন প্রমাণিত যে, তিনি খুব ভালো এবং সুস্বাদু খাবারও খেয়েছেন, তেমনি এটিও প্রমাণিত যে, তিনি অনাহারেও দিন কাটিয়েছেন। কখনো কখনো এত দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকতেন যে, তাঁকে পেটে পাথর বা পট্টি বাঁধতে হতো। কিন্তু প্রত্যেক অবস্থাতেই তাঁর জীবন পরম কৃতজ্ঞতা ও অনাড়ম্বরতায় কেটেছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, **মহানবী (সা.)-এর জীবন ছিল অত্যন্ত সাধারণ ও**

সাদাসিধে। তিনি কোনো কাজকেই অপমানজনক বা ছোটো মনে করতেন না। তিনি নিজের উটকে নিজে দানাপানি খাওয়াতেন, ঘরের কাজকর্ম করতেন, নিজের জুতো নিজে মেরামত করতেন, কাপড়ে তালি লাগাতেন, খাদেমকে পাশে বসিয়ে খাবার খাওয়াতেন এবং আটা পেষার সময় ভৃত্য ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে সাহায্য করতেন। বাজার থেকে গৃহস্থালির জিনিসপত্র বহন করে আনতে কখনো লজ্জা বোধ করতেন না। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার সাথে করমর্দন করতেন, সবাইকে আগে সালাম দিতেন। কেউ যদি সামান্য কয়েকটি খেজুরের দাওয়াতও দিত, তিনি তা তুচ্ছ মনে না করে সাদরে গ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহমর্মী, কোমল হৃদয় ও সহনশীল স্বভাবের। তাঁর চালচলন ও জীবনযাপন ছিল খুবই সাধারণ। তিনি হাসিমুখে ও প্রফুল্লতার সাথে সবার সাথে মিশতেন, তাঁর চেহারায় সর্বদা মুচকি হাসি ফুটে থাকতো; তবে তিনি কখনোই অট্টহাসি হাসতেন না। আল্লাহ্‌র ভয়ে সর্বদা চিন্তিত থাকতেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে কঠোরতা বা কর্কশতার নামগন্ধও ছিল না। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন, তবে এই বিনয়ের মধ্যে কোনো দুর্বলতার ছোঁয়া ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, কৃপালু, দয়ালু ও মহানুভব। প্রত্যেক মুসলমানের সাথে তিনি অত্যন্ত দয়ার্দ্র আচরণ করতেন। তিনি কখনো এত বেশি খাবার খেতেন না যাতে ঢেকুর তুলতে হয়। কখনো লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে হাত বাড়াতেন না; বরং তিনি ছিলেন পরম ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ এবং স্বল্পেতুষ্ট।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উপহার গ্রহণ করতেন এবং নিজেও উপহার প্রদান করতেন। ছোটো থেকে ছোটো উপহার হলেও তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং তার বিনিময়ে উপহার দিতেন। তিনি কখনো কোনো খাবারের দোষ ধরতেন না; পছন্দ হলে খেতেন, না হলে রেখে দিতেন। তিনি খসখসে পশমী কাপড় পরিধান করতেন এবং তালি দেওয়া জুতো ব্যবহার করতেন। তিনি সর্বদা সাধারণ খাবার খেতেন (যেমন যবের মোটা রুটি যা পানি ছাড়া গলাধঃকরণ অনেক কঠিন হতো) এবং সাদাসিধে পোশাক পরিধান করতেন। তিনি (সা.) একবার যবের বিনিময়ে নিজের বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। তিনি একবার এক টুকরো রুটির ওপর খেজুর রেখে বলেন, এটিই এর তরকারি এবং এভাবে খেজুর দিয়ে রুটি খেয়ে নেন। একবার তাঁর সামনে গরম খাবার পরিবেশন করা হলে তিনি (সা.) তা খেয়ে বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র! কতকাল ধরে গরম খাবার খাইনি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এমন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন যখন আমরা কেবল খেজুর আর পানি দিয়েই ক্ষুধা নিবারণ করতাম।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: পবিত্র আত্মা ও পুত-পবিত্র মানুষদের পেট ভরে বা তৃপ্তি সহকারে আহার করা সেই সমস্ত মানুষের তৃপ্তির মতো নয়-যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেছেন যে, তাঁরা এমনভাবে আহার করে যেমন চতুষ্পদ জন্তুরা আহার করে এবং আগুনই হলো তাদের ঠিকানা। মহানবী (স.) এর কোনো এক সময়ে পেট ভরে আহার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নূর ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। সেই তৃপ্তিকে যদি আমরা সেই সমস্ত মানুষের তৃপ্তির সাথে তুলনা করি-যাদের জীবনের মূল লক্ষ্যই হলো কেবল পার্থিব স্বাদ ও ইন্দ্রিয়সুখ ও কামনাবাসনা চরিতার্থ করা এবং যাদের দৃষ্টি কেবল প্রবৃত্তির লালসা মেটানোর মাঝেই সীমাবদ্ধ-তবে সেই তৃপ্তিকে আমরা কখনোই প্রকৃত 'তৃপ্তি' বলতে পারি না। তৃপ্তি ও পরিতৃপ্তির সংজ্ঞায় পুত-পবিত্র ব্যক্তিদের পরিভাষা এবং অপবিত্র ও উদরসর্বস্ব পেটুকদের পরিভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পবিত্র মানুষেরা কেবল সেই পরিমাণ খাদ্যকেই তৃপ্তি বলে অভিহিত করেন-যখন বাহ্যিকভাবে ক্ষুধার তীব্রতা দূর হয়ে যায় এবং নড়াচড়া ও কাজকর্মের ওপর পর্যাপ্ত শক্তি ও সামর্থ্য ফিরে আসে। সংক্ষেপে মোমেনের তৃপ্তি ও পেট ভরার অর্থ হলো-সে কেবল সেই পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করবে, যা তার পিঠকে সোজা ও শক্ত রাখতে এবং আল্লাহর ওয়াজিব ও অপরিহার্য অধিকারসমূহ আদায় করতে সাহায্য করে।

অতএব, সমস্ত রসূলদের শিরোমণি ও সরদার মহানবী (সা.) এর তৃপ্তিকে সাধারণ মানুষের তৃপ্তির ওপর অনুমান করা হলো- 'কিয়াস মা'আল-ফারিক' (যেখানে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে এমন বিষয়ের মধ্যে

ভুল তুলনা টানা)। একইভাবে, বহু মানুষ মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করতে পারেনি এবং শব্দের ব্যবহারের মূল প্রেক্ষাপট ও স্থানকাল বিবেচনা করেনি; ফলে তারা নিজেদের মারাত্মক ভুল ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত করেছে। মহানবী (সা.) এর কোনো এক সময়ে এ কথা বলা যে, 'আমি তৃপ্ত হয়েছি বা আমার পেট ভরে গেছে'-কখনোই সেই সমস্ত মানুষের কথার অর্থের সমতুল্য নয়, যারা নিজেদের জীবনের মূল উদ্দেশ্যই কেবল আহার ও উপাদেয় খাদ্য গ্রহণকে বানিয়ে নিয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পবিত্র মানুষদের কর্মকাণ্ড ও বাণীকে তাদের সুউচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের আলোকেই অনুধাবন করা উচিত; সাধারণ মানুষের সাথে তাদের বিষয়াদির তুলনা করা কখনো সঠিক হতে পারে না। বাহ্যিকভাবে তাঁরা এই জগতের ভেতরেই বসবাস করেন বটে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাঁরা এই বস্তুগত জগতের সীমানা ছাড়িয়ে বহু উর্ধ্বে অবস্থান করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, যখনই আমি দিনে দু'বার পেট ভরে আহার করি, তখন আমার কান্না পেয়ে যায়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কেন আপনার কান্না পায়? তখন তিনি বললেন: আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই পবিত্র অবস্থা মনে পড়ে যায়, যে অবস্থায় তিনি এই দুনিয়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। **আল্লাহ্‌র কসম! মহানবী (সা.) কখনো এক দিনে দু'বেলা পেট ভরে রুটি ও মাংস খাননি।**

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উবাইদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার মহানবী (সা.)-এর সামনে খাবার পরিবেশন করা হলে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা.)! আপনি যদি হেলান দিয়ে খেতেন, তাহলে আপনার জন্য বেশি আরাম হতো। এতে তিনি নিজের কপাল মাটির দিকে এত বেশি ঝুঁকিয়ে দেন যে, তা প্রায় মাটি স্পর্শ করছিল এবং বলেন, আমি তো সেভাবেই খাবো যেভাবে একজন সাধারণ বান্দা খেয়ে থাকে এবং সেভাবেই বসবো যেভাবে একজন সাধারণ বান্দা বসে থাকে; কারণ আমি আল্লাহ্‌র এক সাধারণ বান্দা মাত্র।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **তোমরা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবন অধ্যয়ন করো, যাতে জানতে পারো যে, তিনি কত উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন! পরম গাম্ভীর্য এবং ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কোনো দুর্বল বৃদ্ধা নারীও যদি তাঁকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখতো, তাহলে তিনি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ না সেই নারী তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিত।**

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিঁ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)